Vol. 58 | No. 3 | 2023

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতা

Volume	58
Issue	3
Year	2023
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Shahid Iqbal
Published online	June 1, 2023
DOI	10.62328/sp.v58i3.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v58i3.1
Pages	০১-১৬
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতা

Check for updates

শহীদ ইকবাল

সাহিত্য পত্রিকা

Shahitto Potrika
eISSN 3006-886X
ISSN 0558-1583
Volume 58
Number 3

সাহিত্য পত্রিকা (২০২৩) ৫৮ (৩): ১-১৬
DOI 10.62328/sp.v58i3.1

সাহিত্য পত্রিকা
বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতা

শহীদ ইকবাল*

সারসংক্ষেপ: আধুনিক বাংলা কবিতায় সঞ্জয় ভট্টাচার্য নানা কারণে বিশিষ্ট। কবিতার বস্তুভাবনা ও আঙ্গিক-স্বাতন্ত্র্যে ত্রিশোত্তর কালপর্বে তিনি গুরুত্বপূর্ণ, যদিও তিনি বহুল-পঠিত নন। বাংলা কবিতার আধুনিকতার চর্চায় তাঁকে অপঠিত রাখা অসম্ভব। *পূর্বাশা* পত্রিকার সম্পাদক ও সংগঠক হিসেবেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। সবচেয়ে বড় কথা, ত্রিশোত্তর নক্ষত্রমণ্ডলীতে চেনা-অচেনার ঊর্ধ্বে সঞ্জয় ভট্টাচার্য একজন পাঠঋদ্ধ আদর্শবাদী কাব্যরসিক। প্রসঙ্গত, কবিতাদর্শের অভিমত ও তত্ত্বেও তাঁর দান গৌণ নয়। বর্তমান প্রবন্ধে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতার বিষয় ও বিষয়ান্তর সমসময়ের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরবার প্রয়াস আছে।

রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৬৯)। ব্যক্তিতায় তিনি অন্তর্মুখী, প্রচারবিমুখ। কিন্তু কবিতা ও অন্যান্য লেখালেখিতে এবং ওই সময়ের প্রভাবশালী সাহিত্য-পত্রিকা *পূর্বাশা* সম্পাদনায় দারুণভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন, আত্মনিষ্ঠাপ্রবণ কর্মযোগী হিসেবে সর্বদা থেকেছেন নিরঙ্কুশ। অত্যন্ত ব্যক্তিত্বপ্রবণ, সাম্যবাদী রাজনীতিতে কমিটেড, বিচিত্রদর্শী – পড়াশোনা-কাতর সঞ্জয় ভট্টাচার্য কোনোসময়েই তেমন আলোচনায় আসেননি, অন্তত সমসময়ের অন্যদের মতো। কিন্তু তাঁর কাজ ও কর্মযোগ নানাভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও আলোচনার দাবি রাখে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিত্ব ও কবিতার অভিমুখ, পরিপ্রেক্ষিত যাচাই এবং সৃষ্টিশীল কাব্যভাষার দিঙ্‌নির্ণয়ের চেষ্টা করব। এক্ষেত্রে গৌতম বসু ও ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত *সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতা* (২০০৩) গ্রন্থটি প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

প্রসঙ্গত, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত-অপ্রকাশিত কবিতার সংখ্যা অনেক। কার্যত, এখানে গ্রন্থভুক্ত স্বনির্বাচিত ও মৌলিক কবিতাগুলোর দিকেই আমরা প্রাসঙ্গিক নজর দিতে চাই। সঞ্জয় ভট্টাচার্য যে-সময়ে কাব্যচর্চায় নিরত ছিলেন, সেটা 'বড়' ও গুরুত্বপূর্ণ সময়। আমরা জানি, বিশ শতকের তৃতীয় দশক শুধু বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষ নয় বিশ্বব্যাপী আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা তৎকালীন মানব জীবনকে নানামুখী অবস্থায় সঞ্চারিত ও সংক্রমিত করেছিল। শিল্প-সাহিত্যের জগতে সে অভিঘাতও জুড়ে বসেছিল। অনেকরকম তত্ত্ব-আন্দোলন ও নিরীক্ষা তখন সাহিত্যে স্তরীভূত হচ্ছিল। প্রাচ্য-প্রতীচ্য যোগ, বৈচিত্রিক চিন্তার সম্পাদনা বিভিন্ন মেধাবী ব্যক্তিত্ব ও সৃষ্টিশীল শিল্পীর হাতে নব-রূপায়িত হয়ে বিস্তৃতি লাভ করছিল। বঙ্গদেশেও আধুনিকতা অনতিক্রম্য হাওয়ায় বাঙালি কবি-সাহিত্যিকগণ নিজেদের ভাব ও ভাষায় – রূপ-রস সৃজনের কাঠামোয় পরিচর্যার পথটি খুঁজে নিচ্ছিলেন। আজ শতবর্ষ পরে ওই পরিবর্তন ও রূপান্তরের ধারণাকে এখানে পুনরাবৃত্তিমূলক পর্যালোচনা না করে আমরা বরং সেই অভিজ্ঞতার আলোকায়নকে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাব্য-বীক্ষণে

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

অনুধাবন কিংবা পরিপ্রেক্ষিত যাচাইয়ে আকরিত পর্যায় চিহ্নিত করে – অন্তত কবিতায় তাঁর সক্রিয়তা, স্বতশ্চলতা, রূপান্তরণ, সমুত্থান প্রয়াসনির্ধারণকে – জরুরি মনে করি। বস্তুত, তাতে সঞ্জয়ের কবিতার রূপ-বীক্ষণ ও কর্মকুশলতার 'চিরপদার্থময়' অধঃক্ষেপটুকু বুঝে নেওয়া সহজ হবে। এ কথাগুলো সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিমনকে উপলভ্য করে – বিশেষত, যখন তিনি বলেন: 'আমার কবিতার জন্মক্ষণগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি বলতে পারি যে ওগুলো হচ্ছে আমার বিশেষ সময়ের বিশেষ জ্ঞান। সময়টা কখনো এ-শতকের আবহাওয়া ছেড়ে চ'লে গেছে, কখনো বা আবহাওয়া মনের উপর চেপে ধরেছে। কাজেই জ্ঞানটাও কখনো হয়েছে অনুভব, কখনো সুস্পষ্ট ভাবনা।' (গৌতম ও ভূমেন্দ্র, ২০০৩ : ৬৭০) আগেই বলেছি, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতা সমাজচলতি পাঠকপ্রিয়তা পায়নি, এমনকি তাঁর প্রতি কাব্য-সমালোচকদেরও সমর্থন তেমন মেলেনি – কিছুটা নির্লিপ্ত স্বভাবগুণ বা ততোধিক 'কবি-সাধারণ-সংঘ' উত্তীর্ণ স্বতন্ত্র ভাষাভঙ্গির কারণেই, অনুমান করি।

পূর্বাশা ও সঞ্জয় সমার্থক – *পূর্বাশার* নিয়মিত লেখক জীবনানন্দ দাশ, সাথে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সঞ্জয়ের কবিতার অন্তরঙ্গ পাঠ-অভিজ্ঞতার প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন: 'প্রথম দিকের 'পদাবলী' আমার পঞ্চাশের দশকের কবিতার সঙ্কলন-গ্রন্থ। এই মৃত কবিতাগুলো দুজন মৃত কবিরই ভাল লেগেছিল: জীবনানন্দ এবং সুধীন্দ্রনাথ। যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদের জন্য কবিতাগুলো নয় বলেই হয়তো 'পদাবলী'র পুনর্মুদ্রণ হয়নি।' (সঞ্জয়, ২০১৪: ৯২) এছাড়া সেই উত্তুঙ্গ জীবনস্পর্শী সময়খণ্ডে সঞ্জয় সহযাত্রী কাউকে পাননি। তাঁর অভিমানগ্রস্ত মনের ব্যস্ততাগুলো লুকিয়ে ছিল মূলত পড়া-লেখায় আর স্বপ্নচারী পূর্বাশার প্রাতিষ্ঠানিকতায় – 'মডেল ফার্ম'[২] নির্মাণের কাজে।

'মার্ক্সীয় ভাবনার সঙ্গে অপরিচিত থেকে নয়, পরিচিত হয়েই স্বাধীন ভারতকে চলতে হবে, ভেবেছিলাম।... আর ভেবেছিলাম, যে-রোমান্টিকতায় কবিমনের পূর্ণ মুক্তি সে-পথেই বাংলা কবিতার নব-যাত্রা শুরু হওয়া উচিত।' (গৌতম ও ভূমেন্দ্র, ২০০৩: ভূমিকাংশ) এখানে দুটো বিষয়: মার্কসবাদ ও কবিমনের পূর্ণ মুক্তি; বিদ্যমান ওই সমাজে পূর্ণ সততায় তা সহজ নয়। সঞ্জয় ভট্টাচার্য এ নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়তেন, ধন্দে নয়। সততা ও নিজস্ব তৎপরতার সাধনমন্ত্রে আপাদমস্তক অনিরুদ্ধ ছিলেন তিনি; সে কারণেই মতাদর্শ ও লেখালেখি এবং *পূর্বাশা*-পরিচালন কোনোটাই সহজলভ্য হয়নি। কিন্তু কিছুতেই দমে যাননি। সে আপস স্বভাবেও ছিল না। 'অসুস্থতা-নিবন্ধন অকর্মক দিনগুলি বাদ দিলে চল্লিশ বছরের সাহিত্য-জীবনে বছরের তিন-শো পঁয়ষট্টি দিন, দিনে আঠারো ঘণ্টা, সারস্বত-তপস্যা ছাড়া আর কিছু করেন নি তিনি – গদ্য-সাহিত্যকার হিসেবে, কবি হিসেবে, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস-উন্মোচক হিসেবে, *পূর্বাশা* পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে।' (গৌতম ও ভূমেন্দ্র, ২০০৩: ভূমিকাংশ) তাঁর কাব্যগ্রন্থ: *সাগর ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৩৭), *পৃথিবী* (১৯৩৯), *সংকলিতা* (১৯৪২), *নতুন দিন* (১৯৪৭), *প্রাচীন প্রাচী* (১৯৪৮), *যৌবনোত্তর* (১৯৪৮), *অপ্রেম ও প্রেম* (১৩৫৯), *সঞ্জয় ভট্টাচার্যের স্বনির্বাচিত কবিতা* (১৮৮০ শকাব্দ), *পদাবলী* (১৩৬০), *সবিতা* (১৩৬৫), *উত্তরপঞ্চাশ* (১৯৬৩), *উর্বর উর্বশী* (১৯৬৫), *কথার ভেতর কথা* (২০০১), *আলোছায়ার কবিতা* (২০০২)। এছাড়া লিখেছেন গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ। গদ্যরচনা ও সাহিত্য-সমালোচক সত্তায়ও তাঁর উজ্জ্বল প্রভা বিকিরিত

হয়েছে ওই সময়ের পত্র-পত্রিকায়, বিশেষ করে *পূর্বাশায়*। কবিতায় কবিমনের মুক্তির যে প্রত্যাশা প্রতিশ্রুত ছিল – সেজন্যই কী তিনি 'অপঠিত'? যে সময়রেখার ভেতর দিয়ে তাঁর বয়ঃপ্রাপ্তি, মানস-গঠন – এক অর্থে আর্থিক দুরবস্থার ভেতরে কুমিল্লা থেকে কলকাতায় পুনর্বাসন, *পূর্বাশা* নিয়ে স্বপ্নচ্যুতি ('মডেল ফার্মে'র বিলুপ্তি), চতুর্থ দশকে ট্রটস্কিপন্থার বিপর্যয়, মহামন্দা, মন্বন্তর, বিশ্বযুদ্ধ, রক্তাক্ত দেশভাগ – সামাজিক শ্রদ্ধাহীনতা, অপমান, ঈর্ষা, অবক্ষয়, বিবিক্তি-বিবমিষা, একাকিত্ব, নৈঃসঙ্গ্য, অনস্তিত্ব, ধূসরতা ইত্যাকার ইঙ্গিত কী কবিতায় কোনো মহৎ তাৎপর্য তৈরি করেনি? 'সময়ের দান'ই তো নতুন কবিকে তৈরি করে, নতুন ইশারায় যে শব্দ-স্বাতন্ত্র্য অনুভূতির ঝর্ণায় পরিস্রুত হয় – তাই তো 'মহত্ত্ব'। সঞ্জয় নিছকই কবি নন – কথাটা গতবাঁধা তুচ্ছ হলেও সমগ্রতার ভেতরে নিজস্ব বোধের যে ক্রম-রূপান্তর সেটি তো অত্যন্ত সচেতন ও দূরগামী ছিল – দূরকেই তিনি রপ্ত করেছিলেন এবং তাবৎ তাৎক্ষণিক-সাক্ষাৎ সম্বিৎকে রেখেছিলেন অন্তর্লীন। ফলে কবিতায় নবযাত্রার যে উক্তি তিনি করে গেছেন তা তো যুগেরই মনোভঙ্গি। রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে তিনি সজ্ঞাবান, তাই বোধ করি নিঃসঙ্গও। তাঁর কবিতায় নানা স্তরে এই সজ্ঞার স্বাক্ষর আছে। শিল্পচর্চায় সে কারণেই তিনি জীবনাশ্রয়ী, জটিল ও দুঃখদায়ী।

২

প্রথম কাব্য *সাগর ও অন্যান্য কবিতার* কবিতাগুলো ১৯৩৩-৩৫ সালের মধ্যে রচিত। এর মধ্যে কাব্যবিভার সংহত সংশ্লেষ (ইয়েটস-কথিত *precise emotion)* ও নিরুত্তাপ ক্লেশ দীপিত হতে থাকে। স্বপ্নের প্রশাখায় উর্বশী, নীলিমা, সাবিত্রী, মেঘ-কুমারী বিশ্বলোকের ইশারা অর্জন করে থাকবে। পাবে দিব্যত্বের মহিমা। কিন্তু ঐতিহ্যে লেগে থাকে সংহার মূর্তির তাণ্ডব। সঞ্জয়ের প্রথম কাব্যেই যেন শেষ দিকের পরিপক্কতা মিলে যায়। ছাব্বিশ বছর বয়সের রচনায় শব্দ ও শৈলীর তিনি অঙ্কুশ এঁকে দেন। এই – 'ঊষার আলো'। এ আলোয় প্রত্যাদেশ সূচিত হয়, "উর্বশী"র প্রাথমিক অভিজ্ঞান থেকে – যেখানে *উর্বর* উর্বশীর বিরচন হয়ে উঠবে প্রাচীন ভারতীয় প্রত্ন ইতিহাসের স্বরূপ। এ যেন সীমা থেকে অসীমের দূরবর্তী সমগ্রতার ইঙ্গিত। সেই সীমার প্রলুব্ধতায় কবি লেখেন: 'তা'র নয়নের নিবিড় ছায়ায় আমার নয়ন যদি গাহন করিতে নামে,/উর্বশী, তুমি কারো কুন্তলে ঢেকো না মুখ, সমুখে অনেক রাত' ("উর্বশী")। এর কেন্দ্র এক নির্দিষ্ট সময়খণ্ড – যেখানে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে বিচিত্র অনুভবের প্রতীকী-বৃত্ত – সেখানে ভাষা বহুরূপী; একের পর এক দৃশ্যপট রচনা করে 'নীল পাহাড়', 'আকাশ তল', 'গভীর রাত', 'ফুল কুঁড়ি', 'পাখির কণ্ঠ' – ইত্যাদির ভেতর চিত্ত রূপান্তরিত হয় নির্দেশজ্ঞাপক পথে। কবি বলেন: 'উর্বশী তুমি তোমার আঁধারে আমায় ঢেকো,/সমুখে অনেক রাত।' পৌরাণিক উর্বশী এখানে গগনচারী কিংবা বহু-পুরুষের নিদ্রাহরণকারী অধরা অপ্সরা শুধু নন, এখানে তা ভাবনার সম্প্রসারণে স্বদেশের প্রসূতিগৃহরূপে অন্বিত। তাতে স্মৃতিরোমন্থন ও সময়ের অভিঘাত অবলুপ্ত হয় – আশঙ্কার রাতের নিরাপত্তার ভারমুক্তির সন্তাপ রচনা করে। এখানে উল্লেখ করা যায়, উর্বশী'র উর্বরা রূপের আখ্যা কবি কাব্য-পরিণতির-পর্বে পৃথক ইমেজে চিহ্নিত করেছেন, যেখানে আছে বৈদিক-পূর্ব যুগের চন্দ্রকলা আকৃতির ভূখণ্ডের মানবসভ্যতার প্রত্ন-প্রসূতিরূপ।

"উর্বশী" কবিতাটির পাশাপাশি ওই কাব্যের আর একটি কবিতা "আকস্মিক"। এটি পাঠান্তে আমরা কবির ভাবনা ও ধারণার প্রতিবিম্বিত স্বরূপ-লক্ষণ সন্ধান করি:

কত দিন
জলের ক্লান্ত নিঃশ্বাস
মেঘ হয়ে উঠেছে আকাশে।
আর এক দিন
সে-মেঘ গেল স্বপ্ন হয়ে
পৃথিবীর আকাশ-ভরা নীল ঘুমে।
কেমন ক'রে তা হয়? –
আমার দেহ
ফুলের গন্ধ হ'ল কী ক'রে? (গৌতম ও ভূমেন্দ্র, ২০০৩: ৭০)

'কেমন ক'রে তা হয়? –' সংলাপের উত্তর 'সে-মেঘ গেল স্বপ্ন হয়ে/পৃথিবীর আকাশ-ভরা নীল ঘুমে'র ভেতর তা কী প্রতিশ্রুত? প্রসঙ্গত, ১৯৩৫-পর্বে লেখা সঞ্জয়ের এ প্রশ্নের উত্তর মিশে গেছে নিজের প্রশ্নের ভেতরেই। 'বিংশ শতাব্দীর তিরিশ-পরবর্তী জীবন ছিল পরমতাভ্রষ্ট, ব্যক্তিসত্তাশ্রয়ী এবং যন্ত্রণাবিদ্ধ... কবিদের অবলম্বন ছিল ব্যক্তিসত্তা, সুমহান অনুভব-সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা, মানবতার সংরক্ষণ, সৌন্দর্য-প্রেমতৃষ্ণা এবং প্রতিবেশ-প্রকৃতি।' (বেগম আকতার, ২০২০: ১৫) উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি কী ইত্যাকার বৈশিষ্ট্যজাত! কবিতা-ধারণায় সঞ্জয়ের যে নান্দনিক ডেসটিনি সেটি স্বজ্ঞাজাত – ফলত তা অপ্রচল! কিন্তু প্রচল-অপ্রচলের বাইরে সঞ্জয়ের লিরিক-প্রাণ, কল্পনা-মনীষা কিংবা শিল্পপ্রসাদে শুদ্ধবস্তু অনুসন্ধানের যে প্রচেষ্টা তাতে এ কবিতাটি প্রশ্নসমীপে এক ত্রাণকর্তারই স্বপ্ন বলা চলে। আর বিষয়ের বাইরে কবির যে ইন্দ্রিয়জ অনুভব তা জীবনানন্দের ভাষায় 'বস্তু সঙ্গতির প্রসব' থেকে উদ্গগীরিত। এটা পরবর্তী কাব্যে ক্রম প্রকাশ্য ও রূপান্তরিত হয়ে প্রবহমান। আমরা *পৃথিবী* কাব্যে অন্য এক ক্রুশবিদ্ধ কবির দাহকে পর্যবেক্ষণ করি। 'সঞ্জয় ভট্টাচার্য ট্রটস্কি কর্তৃক গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তাঁর কবিতার অভিমুখই ঘুরে যায়। ১৩৪৬এ প্রকাশিত হয়েছিল সঞ্জয় ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পৃথিবী' যার শিরোনাম নিহিত রয়েছে ট্রটস্কির বিশ্বচেতনা, যার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে নবার্জিত রাজনীতিমনস্কতার প্রবল ভাবাবেগ।' (গৌতম ও ভূমেন্দ্র, ২০০৩: ৭১৭) কিন্তু এরও তো প্রেক্ষাপট আছে! কবির রূপাভাস স্থান-কাল নিরপেক্ষ নয়। বস্তু-ভাব সেখানেই নির্মিত হয়। ট্রটস্কি (Leon Trotsky, 1889-1940)-র বিপরীতে স্টালিন শাসনব্যবস্থায় নাৎসীবাদ যুক্ত হয়ে (মলোটভ-রিবেনট্রপ প্যাক্ট, ১৯৩৯) সাম্যবাদকে যেভাবে নতজানু করে, তখন সঞ্জয় *পূর্বাশায়* হিটলার-বিরোধী সংখ্যা বের করেন। কিন্তু সাম্যবাদের দুটো পথ তখন দুদিকে গেছে বেঁকে, তিনিও রেহাই পাননি। ট্রটস্কি-পন্থায় আস্থার কারণে কলকাতার সমাজ কবিকে গ্রহণ করেনি এবং পূর্বাশার হিটলার-বিরোধী সংখ্যা বাজার থেকে প্রত্যাহার করতে হয়েছে। পত্রিকার প্রকাশও বন্ধ হয়ে যায়। স্টালিনের জাতীয়তাবাদ তথা 'নিউ ডেমোক্র্যাসি' ('পপুলার ফ্রন্টে'র বদলে) লেনিনের সাম্যবাদ থেকে বহু দূরে, ট্রটস্কি চেয়েছিলেন কমিউনিজমের আগুন পুঁজিবাদী ইউরোপসহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক, সেজন্য সর্বাত্মক কাজ করা। স্টালিন সেটি হতে দেননি! ১৯৪০-এ নির্বাসিত ট্রটস্কি মেক্সিকোতে গুপ্তচরের হাতে প্রাণ দেন। একই ধারায় লেনিন

অনুসারীদের পীড়ন ও হত্যা করে স্টালিন রাশিয়ায় স্টালিনবাদ কায়েম করে এবং দেশে দেশে তার সংক্রমণ ঘটাতে স্বীয় রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করতে থাকে। কলকাতায়ও সাম্যবাদের ছদ্মবেশে স্ট্যালিনপন্থা বিকাশ লাভ করে – ট্রটস্কিবাদীরা মার খায়। সঞ্জয়ের পৃথিবী কাব্যে সেই সমাজ-দ্বন্দ্ব আর খেদের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু কবি তো রাজনীতিক নন। সেই সচেতন কাব্যতত্ত্বচিন্তা – যেমনটা *Arts Poetica*য় হোরেস বলেছিলেন প্রেরণা, পড়াশোনা ও প্রতিভার যৌথতা পরিণাম বা শীর্ষে পৌঁছানোর একমাত্র উপায়। এরকম এক উপলব্ধিতে, স্বপ্ন-ধূসরতার বোধে, একটা নতুন পর্যায়ের আভায় কবি স্তরীভূত হতে চান। বস্তুত, তারই প্রকাশ *পৃথিবী*। কবি "মুমূর্ষু" কবিতায় বলছেন: 'আমরা পাই নি এসে পৃথিবীর প্রথম যৌবন' – কী পেয়েছি তবে! কবি বলেন:

> আমরা পেয়েছি শুধু পৃথিবীর অন্তিম দিবস,
> নামে মৃত্যু পৃথিবীর জরাজীর্ণ ভগ্ন দেহ-ময়,
> আমাদের পঙ্গু আত্মা পায় নিত্য মৃত্যুর পরশ
> মানুষের ইতিহাস বুঝি আর হবে না অক্ষয় ॥ (গৌতম ও ভূমেন্দ্র, ২০০৩: ৭৩)

এই মুমূর্ষু পৃথিবীর সংবেদে আতপ্ত হয়ে সঞ্জয় ব্যক্তি-উচ্চারণে বলেন:

> এ শতকের প্রথমার্ধে আমরা যারা সাবালক হয়েছি, তাদের যদি আজকের দিনের প্রাপ্তবয়স্করা মৃত বলে আখ্যা দেয়, তাহলে আমাদের দুঃখ করবার কিছুই নেই। অনেক মৃত্যু পার হয়ে এসেছি আমরা, অনেক শেষ দেখায় প্রাণ বিনিময় করে এসেছি – স্বদেশী সন্ত্রাসবাদে, মারীতে, মন্বন্তরে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে, দাঙ্গায় তিল-তিল প্রাণাশ্রু দিয়ে যদি মৃত্যুই হয়ে থাকে আমাদের, তাহলে সে মৃত্যুর দিনগুলো ছিল আজকের দিনের মহানগরবাস বা জীবিতের মহানরকবাসের চাইতে ঢের রমণীয়। (সঞ্জয়, ২০১৪: ৯৬)

'অক্ষয়' যে হবে না সেটি 'জীবিতের মহানরকবাসে'ই অনুমেয়, অন্তত 'অন্তিম দিবসে'র চেয়ে। সময়গ্রন্থিতে আটকানো 'ইতিহাস', সেখানে কবি মিশিয়ে দিতে থাকেন তাবৎ নশ্বর-অবিনশ্বরের পঙ্ক্তিসমূহ। মানুষ ইতিহাসের সোপানে দণ্ডায়মান। আদিম পৃথিবীর শৈলচূড়ায় নীড় বাঁধা, সূর্যোদয়, মধ্যাহ্নপ্রহর, অপরাহ্ণ – ঠিক যেন মানবের জন্ম ও ক্রমবৃদ্ধির পরিণতি-পরিক্রমা কিংবা পুনরাবৃত্তির চক্রমণ। বয়সী পৃথিবীর পরিক্রমণ-অন্তে তার বুড়িয়ে যাওয়া কিংবা পৃথিবীর নিজস্ব পরিক্রমণের ঋতুচক্র – সবই তো মানব-প্রকৃতির অনুসৃত মাত্রা মাত্র! অতীতের এই বিশ্বাস প্রকৃতির 'ফুলের গন্ধ ভরা দেহ' – পূর্বের কাব্য থেকে পরের কাব্যে আদিম মানবগোষ্ঠীকে ইতিহাসেরই পটে এঁকে দেয়। এসব 'শিক্ষিত স্বভাবের স্পষ্টতা'য় থাকে চিরজাগরূক। "ইতিহাস" কবিতায় সেই সরল চক্রমণ নয়, জটিলতায় বিচ্ছেদে মহানরকের তাণ্ডবে ভঙ্গুর ও নিশানাহীন যেন:

> সে-পথ আর নেই
> অন্ধকারে দুর্গম আর অস্পষ্ট
> পার হয়ে এসেছি সে-অরণ্যময় পথ
> যেখানে মানুষের গায়ে বাঘের নখের দাগ
> সিংহের রক্তের গন্ধ! (গৌতম ও ভূমেন্দ্র, ২০০৩: ৭৪)

এরপর পেরুনো ইতিহাসের গাত্রে থাকে প্রভূত প্রশ্ন: 'ফুটবে না কি আরেকটি শৃঙ্গ/কোনও প্রত্যূষে?' এভাবে আমরা জানতে চেয়েছি সঞ্জয়ের কবিতার লক্ষণ ও বস্তু-উপাদানের স্বরূপ। ক্রমাগত তাঁর ছন্দ ভেঙেছে। গড়েছেও। বোধের দায়বদ্ধতায় নিষ্পত্তি হয়েছে চিন্তার বহুমুখীনতা। ইতিহাসকে তিনি সময়বৃত্ত থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন অনেকান্তে। কল্পনা-মনীষায় তিনি তৈরি করেছেন নানান অভিমুখ, যা জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতির আসঞ্জনে হয়ে উঠেছে রক্তিম। এসব ছড়িয়ে যায় কালোত্তরে, সময়ান্তরে; মহিমামণ্ডিত করে নির্দিষ্ট অভিধায়। কিন্তু স্মর্তব্য, সমকালই কিন্তু তার কেন্দ্ররূপে থাকে। সেইটিই বিকিরিত হয় প্রগৈতিহাসিক-প্রাচীন প্রত্ন-বিভা নিয়ে। আর কবিতার শৈলীও সেরূপেই আবরিত কিন্তু একপ্রকার সংবরণ তিনি কায়েম করে থাকেন; তা প্রখর ব্যক্তিত্বের ক্রুদ্ধ অনায়াসে কাব্য-শাসনও করে, নিয়ন্ত্রণেও রেখে দেয়। তাই কবি বলতে পারেন: 'যে আকাশে রঙ নেই, ওড়ে শুধু কারো এরোপ্লেন –'। বিশুদ্ধতার দিকে ফিরে চলতে চাইলেও পারা হয় না, হবেই বা কেন – যে সময়ের ভেতর দিয়ে আমরা চলি, তা তো ঠিক স্বাভাবিক নয়। বিশ্বযুদ্ধ মানুষকে করেছে একা – আলাদা; আর উপনিবেশের শাসন তো জিইয়ে রাখার নামে তৈরি নানা কূট-আবর্তন। ক্রমাগত কুঁকড়ে গেছে প্রজন্ম, বিলোপ ঘটেছে আত্মচেতনার, বোধ হয়েছে ভোঁতা, মেরুদণ্ড বিক্রীত, সংস্কৃতি-দেশাচার অন্তঃসারশূন্য, সাম্য তপ্তকথা আর অপরিশোধিত মধ্যবিত্ত পচা-গলিত; পক্ষ-বিপক্ষ, স্ববিরোধিতার দোলাচলে তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম জটিল। পরস্পরের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে বিদ্বেষ আর ঘৃণা। বুর্জোয়াবৃত্তির কাঠামোয় নগর এক কৃত্রিম খোলস যেন। কবি যদি তাতে বিনিদ্র হোন, আকাশের রঙ না দেখেন – চলিষ্ণু ইতিহাসের একটা পর্যায়ে সিংহের রক্তের গন্ধকেই তা বিদ্রূপপ্রবণ করে – আর বোধকে ফিরিয়ে দেন সেই শ্লাঘাশীল মানব জীবনের পুরনো যুদ্ধের লড়াইয়ের দিনগুলোয় – যেমন প্রাগৈতিহাসিক মানুষের শরীরে ছিল বাঘের আঁচড়। এসব তো অবিদিত থাকে না। আর ভাঙনশীল পৃথিবী, তাকে কে জোড়া লাগাবে? সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতায় এভাবে সময়ের দাপট চেনা যায়। দৈন্যকেও করা যায় প্রশ্নবিদ্ধ। এমনকি ওই কবিতার নন্দনে 'শিক্ষিত স্বভাবের স্পষ্টতার কথাও উল্লেখ থাকে। ফলে ঈশ্বর-চেতনার ঐতিহ্যকে স্বীকারে নিয়ে কবির কবিতা রূপান্তরের ধারা একটা পর্যায়ে "বিংশ শতাব্দী" ও "যুদ্ধ" কবিতায় অবধারিত হয়। তখন এ দুটি ব্যবচ্ছেদে আনলে তাতে পেয়ে যাই রোরুদ্যমান একুশ শতকের পর্দায় মীড় তোলা বাঁশরির রাগ। কী ধরা পড়ে তাতে! কারণ বুঝে নেই যে, 'কবির কল্পনা মূলত কোন জনগোষ্ঠীর যুগযুগ ধরে লালিত কিছু স্মৃতির সমষ্টি। কবির দায়িত্ব এই স্মৃতিপুঞ্জকে বর্তমান প্রজন্মের হৃদয়ে সঞ্চারিত করে দেওয়া।' (খোন্দকার আশরাফ, ২০১০: ১৬) আর কবি সৃজনের উন্মাদনায় পৃথিবী ও প্রকৃতিকে অভেদাত্মক করে ফেললে তাবৎ পৃথিবীর যন্ত্রণাকে বয়সী সংবেদনায় আত্মস্থ করেন – রতনে-ভূষণে করেন মহিমান্বিত। সঞ্জয় ভট্টাচার্য সিরিয়াস হয়ে সিঞ্চিত আবেগকে বুদ্ধির গম্য করে তোলেন। তাতে পৃথিবীর বস্তুগ্রাহ্যরূপ নির্ধারিত নিয়মে প্রত্যক্ষীভূত হয়। তাই "বিংশ শতাব্দী" কবিতায় তিনি বলেন: 'তোমার পথের কীর্তিস্তম্ভে/অন্ধকারের জন্ম হ'ল'। একইভাবে, কিন্তু অন্য প্রবণতায় বলেন: 'যুদ্ধের জন্ম হ'ল/অন্ধকারে–'; তখন কবির উপসংহার:

তবু এক দিন থাকবে না যুদ্ধ
বন্ধ্যা পৃথিবীর উত্তাপ

– নাইটারে গ্লিসারিনে গন্ধকে লোহায়–

নিভে যাবে সন্তানের স্বপ্নে;
তখন আর মানুষের পৃথিবী নয়
পৃথিবীর মানুষ সবাই। (গৌতম ও ভূমেন্দ্র, ২০০৩: ৯১)

শেষ পঙ্‌ক্তি দুটো প্রবাদপ্রতিম। নির্মেদ সত্যের উপলব্ধি। এই সত্য অপলাপ নয়, একুশ শতকে তা যেন 'বাস্তবের রক্ততট'। কবির উক্তি আর উপলব্ধির সমুত্থান-পর্ব এতে রচিত হয়। বাস্তবতাকে পরিশুদ্ধ করে আবেগের অনুশাসনে শব্দ প্রয়োগের উপায় কবি বুঝে নেন। শব্দ-সমষ্টিতে তিনি বুনে দেন কন্‌টেক্সট – তা বাচ্যার্থকে একপ্রকার করুণ ও নিপতিত কারুবাসনায় জড়িয়ে নেয়। এ এক গ্রন্থন-রূপ, যা কবিরই মুন্সিয়ানা। সঞ্জয়-পরবর্তী সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর নিরতিশয় চর্চা করেছেন। কিন্তু সঞ্জয় প্রখর রকমভাবে নিজস্বতায় স্থির এবং স্বজ্ঞাবাদী। তাতে পিছুটান নেই, নেই আনুগত্যও। রাজনৈতিক বিশ্বাসটি তাঁর মাঝেই অনুরুদ্ধ। ফলে আত্মবিশ্বাসী হয়েই সমস্ত বিধি বা ক্যাননশিপকে তিনি অস্বীকার করেন। শব্দায়ত্তের প্রচণ্ড নিরীক্ষায় ব্রতী হয়ে ভাব ও প্রবণতাকে করে দেন অবমুক্ত। এ অবমুক্তিতে কোনো মেকি বা কৃত্রিমতা নেই– আর দেখনদারি তো নেই-ই।

৩

১৯৪৩-১৯৫৪ সঞ্জয় ও *পূর্বাশার* উৎকর্ষসূচক পর্যায়। এ সময় তিনি যে অনেক লিখেছেন, তা নয়। বিশ্ব রাজনীতির তরঙ্গসংক্ষুব্ধ সময় সেটা। পূর্বাশা প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী আর্থিক যোগানের নিমিত্ত নির্ভরযোগ্য বন্ধু সত্যপ্রসন্ন দত্তসহ 'মডেল ফার্ম' তখন রেজিস্ট্রি হয়। পুনঃপ্রকাশিত *পূর্বাশা*ও নিয়মিত থাকে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অনতি-পূর্ব দ্বন্দ্বদীর্ণ আশা-হতাশা, ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রভূত মানবিক অবক্ষয়ে সঞ্জয় আয়ুক্ষয়ে তখন প্রায় ন্যুব্জ। নৈরাশ্য ও নৈঃসঙ্গ্য চেপে বসেছে। তবুও লিখে চলেছেন, প্রাচীন প্রাচী, যৌবনোত্তর-এর মতো কালজয়ী কাব্য। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু, অগ্রজ অজয় ভট্টাচার্যের প্রয়াণ, প্রিয়জন অণিমা দত্ত বেলার মৃত্যু আর দেশভাগের কারণে কুমিল্লা-পর্ব চুকে যায়। প্রিয় 'মডেল ফার্ম' মুখ থুবড়ে পড়ে, নিজের অসুস্থতা আর জীবনানন্দ দাশের তিরোধান সবকিছু অস্থির করে ফেলে তাঁকে। এ অস্থিরতা ও নিঃসঙ্গতার প্রতিবিম্ব *প্রাচীন প্রাচী* কাব্যের তিনটি দীর্ঘকবিতা। "এশিয়া" "ভারতবর্ষ", "বাঙলা"– গুরুত্বপূর্ণভাবে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের যেন ত্রিবেণী রচনা। অপার এক দেবমহিমা তাতে স্তরিত। দীর্ঘতর কবিতা তিনটি প্রাচুর্যপূর্ণ উপাদানে উত্তীর্ণ তিনটি স্থানিক নাম, তিনটি ইমেজ/প্রপঞ্চ/মহিমা (aura) মিলে বিশালাকার এক দৈবমূর্তি এতে অনুভব্য। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের এ এক অনুপম কীর্তি কিন্তু কাব্যশক্তির যে অন্তর্লীন টান তাতে নিঃসঙ্গ কবির প্রেম-বিরহ, প্রেমভূষিত আত্মা কী বলে? এ কি প্রকট প্রেরণা? যে সময়ে এ কাব্যটি রচিত তখন প্রিয়তমা বেলার অকালমৃত্যু দীর্ঘসময় তাঁকে বেষ্টন করে রেখেছে। ডায়েরিতে ইংরেজ কবি জন ডানের উক্তিকে উদ্ধৃত করে তিনি লিখেছেন *I am Love's martyr*, ঠিক ওই অনুগত উক্তি – 'সেই মৃত্যুমাখা জীবনের সৌরভ ফেলে/এলে আরও গভীর মৃত্যু-স্বপ্নে – ("এশিয়া"), 'মৃত্যুর কথা নয়, ঐশ্বর্যের কথা।/অমৃতের কথা নয়, ঐশ্বর্যের কথা।/মৃত্যুর কি মানে পেয়েছে অমৃতের পুত্রেরা?' ("ভারতবর্ষ"), মথিত কত পুরুষের বিদ্যুন্ময় শক্তি,/প্রাণোৎসিনী ধরিত্রীকে

অনুভব করেছে নারী তা'র দেহের নগ্নতায়' ("বাঙলা")। এমন শূন্যতার ভেতরে স্বদেশকে দেবমহিমা দান করেন, বাইরের আগত অশ্বারোহীদের মোকাবেলা সংকটকেও তিনি করে তোলেন প্রশ্নবিদ্ধ – বৈভবে ব্যাপ্ত ঐতিহাসিক ক্যানভাসে স্বদেশের পরিচয় দুর্মর হয়ে ওঠে। এক ঘনিষ্ঠতার সংস্রবে তা প্রাচুর্যপ্রবণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে 'তুমি'/'তোমার' সর্বনাম কেন্দ্রীভূত – বিচিত্র মনোভাবের যোজনায় হয় তা অতিরিক্ত। আদি এশিয়া-ভারতবর্ষ-বাঙলা হাজার বছরের প্রত্ন-ইতিহাসের ধারাবিবরণীতে অমোঘ মাহাত্ম্যও মহিমা পেয়ে যায়। এখানে দীর্ঘকবিতার আংশিক উদ্ধৃতি দিতে চাই না, কারণ তাতে অর্থবহতা খণ্ডিত হয়। কিন্তু সমগ্র পাঠান্তে কাব্যগুণটি পরিমাপ করলে, সংহত শিরদাঁড়ার যূথবদ্ধ প্রবাহে অনর্গল পুরাণ-ইতিহাসের যৌক্তিক স্তম্ভগুলো 'প্যাথেটিক ফ্যালাসি'তে (অমলেন্দু, ২০০৮: ৩০) পরিণতি পায়। মানবিক অনুভূতি বস্তুতে আরোপিত হলে ঘটে শুদ্ধাচারের সংবেদ। বস্তুত, কবিতার রহস্যসত্তাকে নিরহংকারী নিজস্বতায় লালন করতেই হয়। পরিপূর্ণ একত্রীকরণে তখন তা কোনো না কোনো সময় তীরে পৌঁছায়। প্রমাণস্বরূপ এখানে তিনটি কবিতার চৌম্বক অংশ তুলে ধরি:

ক.
সে দিনগুলোও কি ভুলে গেলে –
নীহারিকা-থেকে-ছুটে-আসা সূর্যের জন্মদিন?
তোমার রক্তের সমুদ্র-ক্ষুধায় উদ্বেল দিনগুলো
কোথায় আজ?
তোমার রক্তে তা'র স্মৃতি নেই।
তা'দের চিতাভস্ম খুঁজে পাবে ইতিহাস-দেবতার পাণ্ডুর ললাটে –
খুঁজে পাবে।
দেখতে পাবে
ব্যাবিলনের জনবন্যা ইউফ্রেটিসের উৎসমুখে ছুটে গেছে –
সিরিয়া-আসীরিয়া-জেরুজালেমে তা'র পদধ্বনি শোনা যায়!
(গৌতম ও ভূমেন্দ্র, ২০০৩: ১৩০-৩১)

খ.
হে প্রাচী,
মায়ের মতো উষ্ণ অনুরাগে তুমি স্পর্শ করতে পারো নি প্রতীচীর তুহিনশীতল বুক –
সে তোমার সন্তান হতে চায়নি, প্রভু হয়েছে।
(গৌতম ও ভূমেন্দ্র, ২০০৩: ১৩৯)

গ.
অবশেষে এক-দিন আর্য এল!
স্খলিত আর্য খলতার সুড়ঙ্গপথে প্রভু হ'ল তোমার।
তবু তোমাকে পেতে নিজেকে ভুলতে হয়েছে তা'র
শিব হয়ে খুলতে হয়েছে শক্তির মন্দির।
(গৌতম ও ভূমেন্দ্র, ২০০৩: ১৪৩)

কবির কবিতা-জগৎ অভিজ্ঞতার আকরে অস্তিত্বায়িত হলে তা এক ধরনের দার্শনিক বোধজাত অন্তঃকরণ প্রস্তুত করে। বস্তুত, অভিজ্ঞতাকে আবেগ ও বুদ্ধির জারণে কবি বৌদ্ধিক প্রসারণ লাভ করে থাকবেন। এই অস্তিত্ব অন্বেষার (ontological quest) বিশেষত্ব যুগমানসের সারাৎসার বললে ভুল হয় না। এ যুগেরই মনোভঙ্গি। ইতিহাসের অভিজ্ঞান এক অর্থে বর্তমানেরই স্ফটিকায়িত রূপ। এই এক অখণ্ডতা ।

দীর্ঘ কবিতার আখ্যানলব্ধ কথকতা, উন্মনা প্রেমপ্রবণ স্পন্দন যে ইঙ্গিতে এখানে উৎসাদিত – তাতে সঞ্জয় ভট্টাচার্য হন আলাদা। বঞ্চিত জীবনে সৃষ্টিবেদনার পরিতৃপ্তিতে দীর্ঘবয়ান নিরূপিত হয়েছে। সুতরাং নিরীক্ষাপ্রবণ এ আঙ্গিক ব্যক্তিগত ও সামাজিক বঞ্চনার দায়ে হয়ে ওঠে অপরিহার্য। ১৯৫০এর দিনলিপিতে তার স্বীকারোক্তি আছে। কবিতা নান্দনিক রূপে পেলে তা আমাদের জ্ঞানকাণ্ডে কতটা প্রভাবসঞ্চারী হয়? যে দীর্ঘ ইতিবৃত্তে কবি আমাদের পূর্ব-পরিচয়ের সূত্র অনুসন্ধান করেন, আত্মজিজ্ঞাসার জন্ম দেন, সেখানে বাসযোগ্য ভূমি তো আর সেই আকারে নেই! ভূগোল তো টুকরো – বিভক্ত, সরে গেছে সম্পর্কের অভিমুখ – রক্তাক্ত দেশভাগ তাকে করেছে শেকড়চ্যুত – মানব বসতির স্বপ্ন খোলামকুচির মতো হাওয়ায় মিলে গেছে – তবে কী সঞ্জয়ের প্রশ্ন সেই স্থানাঙ্ককে ঘিরেই? মান-অভিমান থেকে শূন্যতা, আত্মতায় অনস্তিত্ব অনুসন্ধান আর বিরহকাতর প্রিয়মুখের ফ্যাকাশে স্মৃতি সবটুকু বহুদূর থেকে সমগ্রতায় দেখার সৃষ্টিশীল টানই কী এই দীর্ঘবিতার বয়ান! রহস্যের কিনারে কবিতার স্ফটিক অধঃক্ষেপ – সেটি যতই ধারণাজাত হোক – কবির উপায় আর ইঙ্গিত তো এর বাইরে কোনো সীমা লঙ্ঘন করে না! এমন প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার ভেতরেই সঞ্জয় সমসময়ের সকলকে এড়িয়ে চর্চিত মেধা ও স্ব-সৃষ্টির সৌকর্যের বাতাবরণ রচনা করেন। রয়ে যান আধুনিক হয়ে; কিছুটা সময়ের হয়েও আগামীর।

অপ্রেম ও প্রেম কাব্যের “ইন্দ্রের আবির্ভাব” ও “পারমিতিহাস” একটা আলাদা রকমের উপস্থাপনা। “পারমিতিহাস” নয় মাত্রার ছন্দে নির্মিত। প্রাচীন ভারতকে পুনর্বার খুঁড়ে পুনঃপ্রশ্নে পরিচিত করানো; যেটি আগের আলোচনাতেও ছিল কিন্তু এখানে প্রকাশভঙ্গির নতুনত্বে একটু আলাদা। কবিকে এখানে উচ্চস্পর্শী ও প্রণালি-প্রশিক্ষিত মনে হয়। কেন সঞ্জয় অন্যদের মতো নন, কেন পাঠক তাঁর লেখা থেকে দূরে ছিল; সেটি এ কবিতার উচ্চারণ ও পরিশ্রম থেকেও বোধগম্য হয়। কবিতা লেখার যে দম বা পরিশ্রম – তার উদাহরণ এ কবিতাটি। আমরা জানি, সঞ্জয়ের কাব্যভূমির মৌল বিষয় – সময় ও ইতিহাস, নিছকই তা ত্রিশোত্তর গৎ-বাঁধা কথা নয়; এজন্য যে পড়াশোনা, পর্যালোচনার নিরীক্ষা, পাঠ-অভিজ্ঞতা প্রয়োজন – সেটি তার কম ছিল না। সেটি স্বভাবগত ও আন্তরচর্চিত আমরা পূর্বে কবির সময় ও ইতিহাস জ্ঞানের যে সাক্ষাৎ পেয়েছি – তাই “পারমিতিহাস”-এ এলো। “ইন্দ্রের আবির্ভাব” কবিতা প্রাচীন ভারতের উপনিষদে-পুরাণে-ভূগোলে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সন্ধানের পূর্ণতায় পরিণত। এতে বিধৃত ঐতরেয় উপনিষদের সত্য এ যুগেও পৌঁছায়: ‘পরের অক্ষে প্রীতি দেবতার, পরের পাশায় পরের নেত্রে প্রীত।/নিজের প্রিয়াতে আসক্তি নেই উপপ্রিয়া পেলে তা’র দ্বারে উপনীত।।’ সঞ্জয়ের প্রিয় কবি জীবনানন্দ। কিন্তু তিনি তো জীবনানন্দ নন! বিশ শতকের পরিচিত ধারণা সময়-ইতিহাস নিয়ে খেলেছেন উভয়েই। কিন্তু “পারমিতিহাস”-এর কাব্যগুণের দীর্ঘতর বর্ণনায় আলাদারকম ও স্বকীয়।

ছন্দ-তাল-লয় অন্য, যতি পড়ছে অন্যত্র – টোন পাল্টাচ্ছে, প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা আগের চেয়ে জটিল ও বহুস্বরিক এবং বিজ্ঞ ও রুচিশীল – একটি আদর্শজ্ঞাপকতার পূর্ণ 'চিহ্ন' যেন এটি। বিদ্রূপও সেখানে কণ্ঠস্থ! স্বদেশ অন্ধকার, সে কেন আকাশ পায় না, দূরবর্তী যে সাগরের বিস্তার সে বিশালত্বের লাবণ্য কোথায় – ইত্যাকার সব আলাপ এখানে স্বচ্ছতায় দ্রবীভূত। সঞ্জয় নতুন, পুনর্নিরীক্ষিত। তিনি ধারণ করে আছেন প্রেম আর অভিমান। এ মাটিতে জ্ঞান ও ধ্যানের যে দস্তুর, সেখানে চুম্বন কতটা নিশ্চিয়তার? পুরনো বণিকের বাণিজ্যতরী কিংবা অভিশাপ-আশীর্বাদের তরী তার উৎপাদন ব্যবস্থায় দৈনিন্দিন জীবনের কথকতা – কখনোই তো অমূলক থাকে না। তবে কোথায় সে স্বপ্নের ত্রাণকর্তা? দেশ-কাল-সন্ততি সবই তো ইতিহাসের সহায়তা পায়। তবুও কি তা অমলিন? কিছু প্রশ্নের উত্তর তাই তৈরি হয়:

> থাকে অনিরুদ্ধ দীপঙ্করের শোভা শ্বেতাশ্ব-কলি-প্রিয়া রুক্মিণীর।
> রবে নীর নীরবের চির-কাল মধুজ্বালা লবঙ্গ-এলাচি-দারুচিনির
> অক্ষিবাণে হবে পক্ষীরা বিদ্ধ বৃক্ষের ফল করো যত-না দান
> কচ্ছকন্যা দিদ্দা থাকবে কার্থেজে ডিডো-পাখি বহ্নিমান।।
> (গৌতম ও ভূমেন্দ্র, ২০০৩: ১৭৪)

এবার পঠন বাড়ালে অধীত-জ্ঞানের সীমায় যুক্ত হয় অগ্রবর্তী জীবনার্থ, সেখানে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নাবিকের বাণিজ্যতরীর অর্থাৎ লক্ষ্মী-সরস্বতীর বৈপরীত্যে ঠিক কোন অসীম-অফুরন্তের ইতিহাস পুনর্বার ঘনিয়ে আনে কে কী জানে! কিন্তু জীবন তো ফিরবেই। চিরন্তনতার ঔজ্জ্বল্যেই ফিরবে:

> এস ফুলে এস রূপে বলি-যূপে মধুপের শঙ্খিনী দাও হলাহল –
> কেন এত ভালোবাসো কারো পাখি মোহহীন মন
> হও কল-হংসিনী নাও এ মৃণাল
> আমার তামসী জায়া করেছ আমারে ভস্ম ভাস্বতী তুমি চির-কাল॥ (গৌতম ও ভূমেন্দ্র ২০০৩: ১৭৪)

এই কলাকৈবল্যের চমৎকারিত্ব বাংলা কবিতায় দুর্লভ। কবি দুরাশাগ্রস্ত নন। সে কারণেই বিস্তর পরিক্রমা পেরিয়ে পারমিতিহাসের সংজ্ঞার্থ ডুবুরীর মতো সন্ধান করে চলেন এবং নিঃসঙ্গ-নিবিড় প্রেমিক-পাঠকের হাতে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু 'অ্যাডমেয়ার'টা কবির জন্যই থাকে, শেষ পর্যন্ত। বার বার নতুন কিছু পেয়ে যাই। 'ভর্তৃহরি নই আমি হরিকালদেব বাঙলার পাখি হরিয়াল' কিংবা 'ইন্দ্রাণী হতে চাও তুমি শর্বরী মেয়ে উর্বশী সাধ নেই কেন এই শবরীর লীলা!', 'চঞ্চলা লক্ষ্মী, ঐরাবৎ-ইরা অবিরল দেবে জল শুণ্ডে' – এইসব পঙ্ক্তি আমাদের বিরল অভিজ্ঞতারই সংস্থান। নারীর এ 'ঐরাবৎ-ইরা' রূপক কতোভাবে বিবর্ধিত হয় – 'শর্বরী মেয়ে', 'উর্বশী-সাধ' – হায়রে শর্বরী – আর এই তো 'প্রজ্ঞাপারমিতা'। কবিতা মিশিয়ে চিন্তনের 'আদর্শিক কারুময়তায় ব্যক্ত করে দেন। তখন প্রসঙ্গত মনে করে নিতে হয়: 'To speak of 'literature and Ideology' as two separate phenomena which can be interrelated is, as I hope to have shown, in one sense quite unnecessary. Literature, in the meaning of the word we have inherited, is an ideology. It has the most intimate relations to questions of social power.' (Terry, 1996: 19)

৪

১৯৫৪'র পর সঞ্জয় ভট্টাচার্যের জীবন-পরিক্রমায় পরিণতি ঘটে। বিশেষত এর কারণ, অনেক বড় কিছু মৃত্যুর অভিজ্ঞতা আর শারীরিক অসুস্থতা। শারীরিক তেজ ও তাপ যদিও নুয়ে পড়েছিল, কিন্তু কাজে তার ছাপ পড়েনি। পরিপক্ক ও পরিণতিপ্রবণ জীবনাভিজ্ঞতাতেই *উত্তরপঞ্চাশ, উর্বর উর্বশী*র মতো কাব্য রচিত হতে দেখা যায়। আমরা এ পর্বে কিছু কবিতার উজ্জ্বল উদ্ধার সম্পন্ন করতে চাই। অতঃপর এ-আলোচনার শেষ টানা যাবে।

তবে *পদাবলী* ও *সবিতা*র কথা ইত্যবসরে বলে নিতে হবে। কারণ, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ কবির কবিতাধারায় বাচ্যার্থের যে ক্রমাগত নব-স্ফূর্তি সেটা অসার নয়। *পদাবলী* প্রশংসা পেয়েছিল জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের। এ কাব্যে শবরী, দ্রাবিড়া, শকুন্তলা, ফণীকুন্তলা, অনুরাধা, পত্রলেখা, যক্ষিণী, অনুপা আছেন। মূলত, প্রেমিক ও প্রেমপ্রবণ এরা চির-জীবন্ত। প্রাচ্যীয়। কবি এদের সনাতনী রূপকে ভেঙে করে তুলেছেন 'আধুনিক'। সেটি পড়ে থাকা ফুল নয়, প্রাচীন থেকে উদ্ধারকৃত – অমলিন, অনাঘ্রাত ও অনশ্বর। বরাবরই কবি-প্রবণতায় এরা থাকলেও *পদাবলীতে* তা ধরা দিয়েছে, একপ্রকার লিরিক-সম্ভ্রমে। তাই সেখানে আলাদা মিলবিন্যাস ও ছন্দের কারুচেতনাও যুক্ত আছে। সঞ্জয়ের নায়িকা-নির্মিতিতে, পুরাণের নব-নির্মাণে এবং আত্যন্তিক শক্তির স্বরূপে উন্মোচিত – তা আধুনিকতার প্রস্রবন পায়, স্বকাল পেরিয়ে হয়ে ওঠে সুদূরের পিয়াসী। দৃষ্টান্ত:

> তাই যদি তবে যাও পতিগৃহে দূরবগাহিনী শকুন্তলা
> আর্তা রাত্রিভর্তৃকা যাও এ-বার যাত্রা-সময় হ'ল।
> এমনই দৈব বিগ্রহে যদি মন-উতলা
> কেন আর থাকো দুরভিগ্রহ এই বনমৃগে লগ্ন-গলা?
> কেন হতে এলে উটজদুহিতা যদি তপোবনে এমি ভোলো?
> শুনছ উষ্ণ আর্যপুত্রে সান্দ্র-কুট প্রণয়-ছলা
> হও সপত্ন পত্নী ভার্যা, দুশমন আর যমই বলো
> তারাই কিশোরী বিদ্যাধরীর কৃষ্ণ কর্ণ কুন্তীপুত্রী বৃহন্নলা
> কৃষ্ণা কন্যা হতে চাও যদি তারাই তোমার চন্দ্রকলা ।
> (গৌতম ও ভূমেন্দ্র, ২০০৩: ১৮১)

এমন জীবনবাদিতা অপরিমেয়, দেশজ ও 'ষোড়শী পূর্ণা কলায় ষোল' – অতুলনীয় এক সৌন্দর্যশীল 'ইরা'-ই বটে! *সবিতায়* ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শ্লোক পাই – যেখানে আত্মশুদ্ধি এবং তার উৎপন্ন জ্ঞানের আলোকেই অজ্ঞান দূরীভূত হয়। এই শ্লোকই তার কাব্যমন্ত্র। "মানসীজা"য় শুরু এরপর "ভারতী", "কোনার্ক" এভাবে কবিতায় উপ-শিরোনাম যুক্তের মাধ্যমে তৈরি করেছেন দীর্ঘকবিতার স্বাদ। তুমুলভাবে তা পুরাণ, ইতিহাস ও ঐতিহ্যে অন্তর্লীন। চরমোৎকর্ষই সৃষ্টিশীলতার বহিঃপ্রকাশ। সেখানে ভৌগোলিক যাত্রারথে কবি প্রবহমান। মহাজাগতিক ইশারায় কবি এখানে ঐতিহ্যিক স্বাতন্ত্র্যে আধুনিক। সুমেরু পর্বতের নদী জম্বু, হিন্দুভারতের দ্বার ছেড়ে মানব কী চায়! চাঁদ, চিত্রা, নীলপদ্ম, ফুল, তরুলতা, রামায়ণী দেশ, কিছুই তো অস্বীকার করা চলে না। ধর্মীয় ঐতিহ্য, এশিয়া তথা

ভারতবর্ষীয় মোটিফসমূহ কবি ফিরিয়ে আনেন। অনুভবের ভেতর প্রত্ন-প্রতিমার পুনর্বাসন করেন। কেন? কারা এরা? প্রয়োজনইবা কী? পরিশুদ্ধ আত্মপরিচয়ের ভেতর মননশীলতার নবায়ন ঘটলে প্রাত্যহিকতার সচলতা সজীব হয়ে ওঠে। খুলে যায় নবতর অভিমুখ। *উত্তরপঞ্চাশের* সঞ্জয় সমকালীন। তর্পণ ও অভিজ্ঞান প্রস্তুত। এ কবিতাগুলো দর্শনের ভেতর দিয়ে আলাদা। বলার প্রয়োজন নেই কিন্তু বুদ্ধ, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ; পাশাপাশি "জর্নাল"ও আছে কবির প্রেরণা প্রবারণা; আছে আশাবাদের আকাঙ্ক্ষী সন্তাপ। সম-সময়ের স্ক্রিপ্ট, অনেকটা বেরিয়ে এসেছেন পূর্বের বিষয়-অধিকৃত এলাকা থেকে। কোনো তারল্যময় ক্রন্দনধ্বনির স্থূল গৎবাঁধা আক্ষেপের তর্পণ নয়। জীবনানন্দের মৃত্যুতে লেখেন: 'একটি জাহাজ ছেড়ে গেল/হ'ল নিরুদ্বেলও/মনের জেটির কাঠ নেই আর ওঠা-নামা মাল।' এমনই তার অন্ধকার প্রজ্ঞা-আত্মা-মৃত্যু-ক্ষমতা-জিজ্ঞাসা প্রভৃতি থেকে বর্তমান-অতীত-ভবিষ্যতের কালযাপন প্রয়াস। তবে কবির ক্রান্তি কি কেটে যায়? না, পালাবদল ঘটে। শুভপ্রদ ও শুদ্ধতাই যে তার কাম্য!

উর্বর উর্বশী সঞ্জয় ভট্টাচার্যের তিরোধান-পূর্ব শেষ কাব্য। জটিল ও রহস্যদীর্ণ এ গ্রন্থ। উর্বশীর ইঙ্গিতপূর্ণ আলোচনা পূর্বেই করেছি। কিন্তু *উর্বর উর্বশী?* বইটির পরিশিষ্টে কিছুটা জট খোলার ব্যবস্থা করেছেন স্বয়ং কবি। এতক্ষণের আলোচনায় আমরা সেটি উপলব্ধি করেছি। সঞ্জয়ের কাব্যবৈশিষ্ট্যে অধিকার করে আছে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস । নিপুণ পঠনে সে ইতিহাসকে বুনে দিয়েছেন কাব্যভূমে নির্বিশেষরূপে। এর কারণগুলো জীবনেতিহাসের মধ্যেই গৃহীত। কর্ম-অভিজ্ঞতা ও পাঠ-অভিজ্ঞতা তার প্রমাণ দেয়। আর তাতেই ধরা পড়ে কেন সে ইতিহাস! ত্রিশোত্তর যুগযন্ত্রণার প্রদাহে কবি এসবকেই নির্বিকল্প মনে করেছেন। বাংলাদেশের কুমিল্লা (প্রাচীন বাংলার 'সমতট' অঞ্চল) থেকে ফিরতে হয় কলকাতায়। কলকাতা যে অবিভক্ত বাংলার সাংস্কৃতিক মস্তিষ্ক! সাহিত্য করার ক্ষেত্র। ঢাকা ছেড়ে বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্তের মতো তাঁকেও কলকাতায় আসতে হয়। কিন্তু স্থানচ্যুতির/মাইগ্রেশনের যন্ত্রণা কী ছেড়ে যায়! যায় না। শেকড়চ্যুত মন ও মস্তিষ্কের জ্বালা কম নয়! আর *পূর্বাশা* চালানোর অভিজ্ঞতা? *পূর্বাশা* পত্রিকা ও প্রতিষ্ঠান করতে গিয়ে দেশভাগ ও পূর্ব-বাংলার স্বভূমি-বিচ্ছেদ 'মডেল ফার্ম' ফেল করা – সব ভেঙে পড়ে। বাস্তবও তাই। শিল্পীমন তখন পর্যুদস্ত। নানাভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শ কিংবা দ্বন্দ্ব ও একাকিত্ব, নির্লিপ্তি, নৈঃসঙ্গ্য, বিচ্ছেদ – একাকার। এর ভেতর লেখালেখির দর্শন আর কাব্যসত্য রূপান্তরিত রঙে স্ফটিকায়িত। রবীন্দ্রোত্তর সময়ের যে কালখণ্ডে সঞ্জয়ের সাহিত্যচর্চা-জীবনচর্চা সবটাই যেন আশীর্বাদ-অভিশাপ দুটোই পেয়ে যায়। সৌন্দর্য সৃষ্টির যে প্যাশন সেখানে নিয়তিও কম কী! তাই তো শেষজীবনে কাব্যের পরিশিষ্ট রচনা করতে গিয়ে লেখেন: 'পৌরাণিক জম্বুদ্বীপের উল্লেখ দেবানং প্রিয় প্রিয়দর্শী অশোক-মৌর্যের ব্রাহ্মীলিপিতে আছে। মৌর্যলিপিতে, জম্বুদ্বীপে 'যিম' বা যমের কাল ছিল বলা হয়েছে। ঋকবেদের ও উপনিষদের যম ইরানী আবেস্তায় ও মৌর্যলিপিতে 'যিম' নাম পেয়েছে দেখা যায়। ইরানীয় আর্য ও ভারতীয় ('ভারত' নাম আর্য আওতায় এসেছে) ঋক্‌বেদের জনসমূহের প্রত্নৌকের (প্রাচীন বাসস্থান) আর্য যম-কালে জম্বুদ্বীপে বাস করতেন। মৌর্যশ্রুতিতে ও পুরাণে জম্বুদ্বীপ তাই ভারতেরই বিকল্পে ব্যবহৃত' (গৌতম ও ভূমেন্দ্র, ২০০৩: ৭৫৯) এই জম্বুদ্বীপ তো সমগ্র এশিয়া! এশিয়া মাইনরের বিস্তৃতি দ্রাবিড়, আর্য

সভ্যতা ঘিরে – সেই মেডিটেরিয়ান সী'র দক্ষিণ প্রান্তে প্যালেস্টাইন থেকে উত্তরে সিরিয়া-ইরাক, মেসোপটেমিয়া হয়ে দক্ষিণের পথে, পূর্বে পারস্য উপসাগরের চন্দ্রকলা আকৃতির ভূখণ্ডে – তা-ই মানবসভ্যতার পাদপীঠ। সূতিকাগার। সাধারণত, ইলাবৃত জম্বুদ্বীপই জাতি-বিবর্তনের জন্মভূমি। এর সঙ্গে নিশ্চয়ই জীবন-জীবিকা, বণিকবৃত্তি, উৎপাদন-সম্পর্ক, অধিকার ও অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামও রয়েছে। তাই সুমেরীয় সভ্যতাই প্রধান। এর কৃষিবিদ্যা, গণিতচর্চা, লিপিচর্চা কতকালের ধ্যান! সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিমানসে সেই 'উর্বশ' – উর্বর চন্দ্রকলার বিমূর্তরূপে দ্রবীভূত। এই-ই কবির নির্বাচন। আর স্বীয় ক্যারিজমায় তার নির্মাণ। উর্বশীর প্রথাগত আখ্যা পেরিয়ে যায় – সে পৌঁছে যায় সুমেরীয় অঞ্চলে, প্রাচীন সভ্যতার শিলীভূত সত্যে – কবি ভাবনা তা অপ্রতুল – তুমুল এক সম্প্রসারণ সেখানে গড়ে ওঠে – ইমেজ – পায় নতুন অর্থ – এই অর্থমুক্তির অভিনবত্বই আমাদের প্রার্থিত কবিতা। এই স্পর্ধার পরিচয়েই স্পর্শিত নতুন-ধর্ম – যা চির-আধুনিক। অলীক আর বাস্তবের সেতুবন্ধ। চন্দ্রকলার 'ফার্টাইল ক্রিসেন্ট'[৩] মানবজাতির অস্তিত্বজ্ঞাপক সামগ্রিকতা। আসন্ন প্রসবার কল্পনা 'উর্বশী'। আর উর্বরতা তারই মাত্রান্তর। এইভাবে পৌরাণিক নারীর বৃত্তান্ত বৃহত্তর অর্থে মাতৃস্বরূপা, প্রজননশক্তির আধারে পরিণত। এ ইতিহাস অনেক আগের। ভূ-ভারতে হিন্দুধর্ম আসারও আগে (প্রাক-বৈদিক যুগে), তখনই কৃষিভিত্তিক জীবনের সূত্রপাত। আমাদের কৃষিসভ্যতার সঙ্গেও এই নারী-প্রজনন-মাতৃত্ব অভেদাত্মক – ঋতুচক্রের সঙ্গে সাদৃশ্যজাত। প্রসঙ্গত, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিমন এলিয়ট-কথিত বহুপ্রচলিত ট্যালেন্ট ও ট্রাডিশনের সংবেদনায় সমুত্থিত। প্রশ্ন আসে, কবির প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যয়ন এবং কবিতাচর্চার ভেতরে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক বুনন নির্বিবাদে কী স্বজ্ঞাবাদী চিন্তনের সারার্থ? অবারিতভাবে যদি তাঁর কাব্যধর্মে ভারতবর্ষীয় তথা বাংলায় হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-জৈন ইতিহাস ও জাতিগত সংগ্রামের ধারণসূত্র সংস্থিত হতে দেখি তখন কবির এ সংস্থাপনা কী স্বভাবিক এবং সংস্কারমুক্ত? তাইতো – 'lacan [Jacques Lacan (1901-1981)] dirrerentiates writing from language, for its specific feature as writing carries unconscious knowledge within itself, whereas languase attempts to resist and displace this knowledge.' (Azari, 2008: 64) ফলে, কাব্য-সংবেদের যে স্ফটিকায়িত প্রেরণা তা স্বজ্ঞাজাত(intuitive)ই বটে। আর নির্মিতির রূপায়ণও সাবলীলতায় সংহত। *উর্বর উর্বশী* কাব্যের পাঠ নিতে গেলে সেটা নিশ্চিত হয়। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, লিপি ব্যবহার, ভাষা ও শব্দব্যবহারের সূত্রগুলোর যোজনা বা ঐতিহ্যিক পরম্পরার ব্যবহার – এই প্রমাণইবা কম কীসে! কাব্য-উপাদানে এ মনন তিনি গ্রহণ করেন। প্রথম কবিতা "অগ্নি-বর্জন"-এর শেষ স্তবক:

কাঁদবে কে নেই ব'লে কন্দর্পের তুণ?
ফুল নেই, কেউ কাঁদবে না।
নেই ব'লে সে-বসন্তসেনা
জম্বুর বিম্বোষ্ঠী কোনও মদনমন্দিরে, হায় কেউ কাঁদবে না।
হয়তো গুনছে আজ অঙ্গনারা বসন্তেও সমুদ্রের ফেনা –
অঙ্গে ঢেলে গোলাপ-ভস্মের ক্ষুদ্র শিশি।
শুধু আমি তাভস্ম-পাত্র হাতে অয়নান্তে ভাবছি, তোমাকে।
(গৌতম ও ভূমেন্দ্র, ২০০৩: ৩২৯)

সবটুকু তবে ফিরিয়ে নেওয়া, আর অয়নান্তে ভাবা! তাহলে ‘সব গ্রাম জেগে ওঠে মৈনাস সিন্ধুর থেকে লোহিত সিন্ধুর দেশে পায় উর্বশীর ছোট-ছোট ঊষা নাম’ – সেটি আগত-সম্ভব সত্য। কবিকে এভাবে কম্প্রমান ও সংগীতব্রতী মনে হয়। তবে প্রত্ন-পিপাসা তার ক্রমে বেড়েছে। প্রত্যেকটি কবিতায় প্রত্ন-পৌরাণিক সুদৃঢ়তা বিদ্যমান। উদ্বাস্তুচেতনায় জীবন যখন ছিন্ন-ভিন্ন তখন জীবনের ন্যায্যতা ধরা থাকে – অনুপ্রাসময় লহমার টানে কবি লিখে ফেলেন: ‘যাব না যাব না আর ও-পুরে পুরুষ পুরুরবা।’ পুরুরবা-উর্বশী সম্পর্কের উর্বরত্বর পিতামহ প্রপিতামহ জৈব রস-সুধা অন্তর্লীনরূপে রপ্ত। দীর্ঘ সে যাত্রারথে প্রেম সমান হৃদয়। মনে করিয়ে দেন – ‘ভূরিশ্রেষ্ঠে, চান্দেলার খাজুরাহে, নাটঘর, রানিচোর ভুলো না বাঙ্গাল।’ কিছুই কী অবশিষ্ট থাকে – মৌর্যের পাহাড়, অসুরের হাড়, বুদ্ধ, বর্ধমান, অশ্বমনোরথ, জিউস পাহাড়, মহেন্দ্রের দ্বার – আরো দিগন্ত সন্ধির কতো কী! কিন্তু সামগ্রিক আহ্নিক প্রাত্যহিকতায় ভৈরবীর তানে মুখ ঘুরিয়ে নেই আত্মপরিচয়ের দিকে। তখনই মন হয়ে ওঠে বিষাদ ও বন্ধ্যাত্বে ভারাক্রান্ত। সবই জীবন্ত ও উর্বর। কোথায় ফিরবে কে! হরপ্পা, মহেঞ্জোদারোর কাল আর সেই পুণ্ড্র-সমতট কুহকী ছন্দের বারতায় ঝরছে পড়ি-হোরি – সবটুকুই পূর্ণতার ছন্দ। “খেয়াল" কবিতায় কবির আলাপ-অস্থায়ী-অন্তরার অংশ থেকে পাঠ নিলে স্পষ্ট হয় – জম্বুদ্বীপ স্থানিকতা; আর সেখানে আস্থার বিপরীতে যেন গ্লানিই কাঙ্ক্ষিত। ‘তিমির হনন ক’রে লাভ?’ – তখন পৌরাণিক পৃথিবী বর্ণনা করে কবি ব্যর্থ হন না –কারণ, সমুদ্রের রুদ্রবীণার ছটায় ভাটিয়ালি বোনে; গীতায় তোলে গীটারের ধ্বনি – তবুও আঁধার কী অবলুপ্ত হয়! এভাবে “কৌমার ব্রাহ্মণ”, “চালচিত্র” লিখে ফেলেন কবি। ভীমপলাশি রাগের মূর্ছনায় গড়ে ওঠে “পুরুরবার কান্না”র অলীক লিরিক। দারুণ রকম সৃষ্টিশীলতায় তিনি বুনে দেন অচিন্ত্য প্রত্নছায়ার রাগ-রাগিণীর মীড় – সেইটিও ওই জম্বুদ্বীপেরই সীমানায়। ওই তো সভ্যতার কেন্দ্র। জীবনের মূলীভূত সুর ও ছন্দের নিবন্ধন তো সেখানেই। প্রায় একই বোধের কাছাকাছি – “নগর-পত্তনের পটমঞ্জরী”। ভরতনাট্যম্ নাট্যউৎপত্তির কুশীলব নিয়ে কাব্যনাট্যের পরিবেশ প্রস্তুত – উর্বশী’র সংলাপ – ‘শপথ ভেঙেছ তুমি, তোমার ধারণা বিবসন পুরুষ অক্ষত?’ কিন্তু পুরুরবাকে ছেড়ে দেয় উর্বশীকে – আগামীর কাল্পনিক আশায়। আহা! এই কী তবে কবি-স্তব? ‘আমরা অনুমান করি, একদা গগনবাসী উর্বশীর মধ্যে ভেসে উঠেছিলেন সেই নারী যিনি অতিবাস্তব কিন্তু শেষত অলীক, একমাত্র স্বপ্নাবস্থায় যিনি পুরুষের প্রাপণীয়। আর সঞ্জয় ভট্টাচার্য হয়তো চিরভ্রাম্যমাণ, চিরঅনুসন্ধানরত পুরুরবা, যিনি বহু কষ্টভোগের পর উর্বশীর দেখা পেলেন অবশেষে ... উর্বশী আকাশ এবং পুরুরবা ধরিত্রী, তাঁরা মিলিত হতে পারেন শুধুমাত্র দিগন্তরেখায়, আর কে না জানে দিগন্তরেখা একটি অনুভব মাত্র কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই তা’র।’ (গৌতম ও ভূমেন্দ্র, ২০০৩: ৭৫০) ‘চন্দ্রকলা উর্বশীর কোন মেয়ে, না, কোন শশকে/দিয়েছি আমিই রক্ত খ্রিস্টপূর্ব ক’হাজার শাক্যে কিংবা শকে?’ এভাবেই এই মহতী কল্পনার প্রেম “পিতৃলোকের ধ্বনি”তে প্রতিধ্বনিত:

> ভুলো না এ-নাম; তুষারের অস্থিভস্মাধারে
> লিখো যে, নিহত, মৃত নয় এ-ভিষক,
> প্রেতীষণি অগ্নি-উন্মীলনে পুরোহিত। (গৌতম ও ভূমেন্দ্র, ২০০৩: ৩৬৯)

আর এর বিষয়ান্তরে লেখা ''পারমাণবিক বিস্ফোরণ'', ''রবির ধ্রুবপদ'', ''রবীন্দ্রোত্তর''। এ কবিতাগুলো একদম প্রেরণাধর্মী, নিজস্ব অভিপ্রায়ের। তবে কবির তো সব কবিতাই শিল্প-উত্তীর্ণ থাকে না – পুনরাবৃত্তি থাকে, থাকে সমসময়ের অভিজ্ঞতার 'রাগী' স্টেটমেন্ট। সেটি বড় কবিকে সময়রেখার ভেতর দিয়ে ছুঁয়ে চলে। সৃষ্টিতে তখন অনিবার্যতা গ্রাস করে। তাইতো নানারকম বিচরণ থাকলেও কাব্যচর্চা ও কাব্যানুচিন্তন তো চলেই একরোখা হয়ে। সঞ্জয় ভট্টাচার্যও তার ব্যতিক্রম নন। যা হোক, কবিতার পাশাপাশি তার যে গদ্য রচনা – সেগুলোও সময়ের পাঠ্য; অন্তত বিশ্বাস হয়, সামগ্রিক সত্তার পরিপ্রেক্ষিতে তারও গুরুত্ব কম নয়। *আধুনিক কবিতার ভূমিকা, অজানা বঙ্গকে জান, ভারতীয় সমাজ ও নারী, মহেঞ্জোদারোর কুশান সভ্যতা, গৌতম বুদ্ধ* প্রভৃতি গ্রন্থ এক চিন্তাশীল মননসত্তারই সৃষ্টিধর্মী প্রকাশ। সে 'বিবেক'-এর সন্ধান আমাদের নিষ্পত্তি করতে হবে।

৫

'শব্দ মানে বিষয়ের ও বস্তুর প্রতীক' – তাই শব্দই তাঁর কবিতা-সৃষ্টির সার্বভৌমত্বে মণ্ডিত তাতেই তিনি পেরিয়েছেন। দেখা-শোনার মধ্যে বোঝার দায়ে শব্দকে প্রকাশযোগ্য করেছেন। প্রকাশযোগ্যতা দিয়েছেন। আমরা কিছু কবিতার ভেতর দিয়ে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাব্যপ্রাণকে অনুধাবনের চেষ্টা করেছি। কিন্তু এই শেষ কথা নয়! কবি-অভিমানী ও আত্মভুক ব্যক্তির যে সংকল্পশীল ব্রত – সবকিছু অতিক্রম করে যে একলা চলার শক্তি সেইটিই তাঁর কবিতা। আর কবিতার বিষয়বস্তু ও প্রকাশধর্মও ওইরূপ যন্ত্রণারই বহিঃপ্রকাশ। সাহিত্যিক ও সাহিত্যের সাংগঠনিক স্বপ্ন অভেদাত্মক হলেও প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির ঊর্ধ্বে তুমুল ও বিচিত্রমুখী পাঠাভ্যাসের ভেতর দিয়ে যুগের মনোভঙ্গিটি তিনি বুঝে নিতে চেয়েছিলেন। সেখানে কোনো প্রতারণা বা অসততা নেই। তাতে করেই গড়ে উঠেছিল তার দৃঢ়চেতা নিরাপোসী বিশুদ্ধতর যাত্রার পথরেখা। সাহিত্য করাই শুধু নয়, সাহিত্যচিন্তাতত্ত্বেও তিনি আগ্রহী ছিলেন। সেটি তাঁর সাহিত্যচর্চার সঙ্গে কোনো বিসম্বাদ তৈরি করেনি। চিন্তাতত্ত্ব আর সৃষ্টিধারা ছিল একসূত্রে গ্রথিত।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের *পূর্বাশা* ও জীবনানন্দ-সংশ্রব এবং জীবদ্দশায় তাঁর সর্বশেষ প্রবন্ধ গ্রন্থ *কবি জীবনানন্দ দাশ* পাঠান্তের অভিজ্ঞতায় এমনটা মনে হয় – 'সময়' ও 'ইতিহাস' ধারণা বিষয়ক প্যাশন – যা তার উচ্চতর একাডেমিক পড়াশোনারও নির্বাচন ছিল (১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষা দিয়ে, বত্রিশ বছর বয়সে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন), অন্তত ছাব্বিশ বছরের লেখালেখি শুরুর পর্ব থেকে কী আইকনিক কবি-ব্যক্তিত্বটি (জীবনানন্দ) তাঁর লেখায় কোনো প্রভাব সৃষ্টি করে থাকবে – বিশেষ করে যখন মহাপৃথিবীর উৎসর্গ পৃষ্ঠার বন্ধনটুকু পিছু ছাড়ে না – সঞ্জয়ের কাব্যপাঠে তা মনে হয়নি, তিনি বিশিষ্টই থেকেছেন – বিচিত্র পথে; ততোধিক সিরিয়াস হয়ে খুঁড়ে বের করেছেন জম্বুদ্বীপের জহুরীসব – যা তাঁর সমস্ত কবিতার প্রাণভূমির অকুস্থল-স্বরূপ। এই প্রচারবিমুখ, কথিত পাঠকশূন্য কবির কবিতার দায়ে আমাদের এখন প্রয়োজন তাঁকে নিরন্তর পাঠ করা, পাঠালোচনায় পরিপুষ্ট করা। তাতে আমরা সমৃদ্ধির পথ এগিয়েই যাব।

টীকা

১. ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে, 'লক্ষ্মী কেবিন' নামের এক চায়ের দোকানে *পূর্বাশা* পত্রিকার জন্ম হয়। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় বৈশাখে, সম্পাদক: সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সহ-সম্পাদক: অজিত গুহ, মুদ্রাকর ও প্রকাশক: নারায়ণ চৌধুরী এবং কর্মাধ্যক্ষ: সত্যপ্রসন্ন দত্ত। মুদ্রিত হয় কুমিল্লার (বাংলাদেশ) 'সিংহ প্রেস'-এ। পরের বছর ১৩৪০ বঙ্গাব্দ থেকে এটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। এবং বাংলা সাহিত্যে নতুন বিষয়, প্রশ্ন ও উদ্বেগ নিয়ে প্রকাশক-প্রত্যাখ্যাত লেখকদের স্থান করে দেন এবং এ লক্ষ্যে পত্রিকাটি নিজস্ব পথের সন্ধান পেয়ে যায়। (গৌতম ও ভূমেন্দ্র, ২০০৩ : ৭১৫)

২. ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে, পঞ্চাশের ভয়াল মন্বন্তরের মাত্র কয়েক মাস পূর্বে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য-সত্যপ্রসন্ন দত্তর যৌথ উদ্যোগে 'মডেল ফার্ম অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড' স্থাপিত হয়। স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতবর্ষে 'ম্যানেজিও এজেন্সি' প্রথা তখনও বিলুপ্ত হয়নি, পূর্বাশা লিমিটেড-কে মডেল ফার্ম-এর ম্যানেজিং এজেন্ট নিযুক্ত করা হয়, কার্যত এটি তত্ত্বাবধায়কের পদ। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে পতিত জমি উদ্ধার এবং উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের দ্বারা কৃষিব্যবস্থার পরিকাঠামোয় তথা উৎপাদন সমৃদ্ধির একটি ক্ষেত্রনির্মাণ – মডেল ফার্ম-এর মূল লক্ষ্য... আর পাঁচটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি যা ক'রে থাকে সে-পদ্ধতি অবলম্বন করে মডেল ফার্ম সাধারণ মানুষের লগ্নি থেকে অর্থসংগ্রহ করতে সচেষ্ট হয়েছিল, কিন্তু আশানুরূপ ফল মেলেনি। (গৌতম ও ভূমেন্দ্র, ২০০৩ : ৭৫১)

৩. কৃষিবিদ্যা অর্জনের পর ছোট-ছোট শিকার-সংগ্রাহক (hunter-gatherer) গোষ্ঠীগুলি যখন টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীতীরবর্তী অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করতে শুরু করল তখন থেকেই মানবকল্যাণের সঙ্গে শস্য উৎপাদনের তথা ঋতুচক্রের চিরকালীন সম্পর্কটি সুদৃঢ় হ'ল। কল্যাণকামনার অর্থ তখন পার্থিব; জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও শস্যফলনের প্রাচুর্য দ্বারা নির্ধারিত, কিন্তু অনুমান করা যায়, এটিই মানুষের আশ্রয়স্থল, প্রার্থনার তথা ধর্মচেতনার, প্রাথমিক স্তর। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৮০০০ থেকে শুরু হওয়া পৃথিবীর ভূখণ্ডের যে অঞ্চলে এই জটিল প্রক্রিয়াটি সক্রিয় হয়েছিল, পণ্ডিতগণ তা'র নামকরণ করেছেন *Fertile Crescent* (গৌতম ও ভূমেন্দ্র ২০০৩ : ৭৬৩)

গ্রন্থপঞ্জি

অমলেন্দু বসু, ২০০৮। *প্রবন্ধসংগ্রহ* (প্রথম খণ্ড), বাণীশিল্প, কলকাতা।

খোন্দকার আশরাফ হোসেন, ২০১০। *রোমান্টিক ও আধুনিক কবিতার অক্ষ-দ্রাঘিমা,* নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

গৌতম বসু ও ভূমেন্দ্র গুহ (সম্পাদক), ২০০৩। *সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতা,* গাঙচিল, কলকাতা।

বেগম আকতার কামাল, ২০২০। *শতাব্দীসন্ধির কবিতা: দিশা ও বিদিশা,* কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ২০১৪। কবি জীবনানন্দ দাশ, ভারবি, কলকাতা।

Azari, Ehsan, 2008. *Lacan and the destiny of Literature*, continuum, London - New York.

Eagleton, Terry, 1983. *Literary theory: An Introduction*, Blackwell, USA-UK-

Australia.